The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 9, No. 18, Publishers: Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

তিতাস একটি নদীর নাম: প্রবাদ প্রবচনে নান্দনিক

নাজনীন আক্তার*

Abstracts: Literary idioms are a good source of collecting aesthetic information about a novel. This study aims at examining the variations of idioms and their functions in the novel entitled *Titas Ekti Nodir Nam*. The main focus of this paper is to categorize different types of idioms used in this novel and along with this their meanings and functions are also analyzed within the framework of aesthetics. This study uses document analysis to explore the innate relation of idioms and the narrative of the novel.

১. ভূমিকা

ব্যক্তিমানস যখন তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিগূঢ় আবেগ ও বিশ্বাসকে সুগঠিত রূপ দিতে সমর্থ হয় তখনই সে সৃষ্টিশীল, সৃজনশীল ও প্রজ্ঞার অধিকারী হিসেবে সার্থকতা লাভ করে। 'কেননা উপন্যাস হল ঔপন্যাসিকের জীবনার্থের রূপান্বিত রূপক' (সৈয়দ আকরম, ১৪২১ বঙ্গাব্দ : ০১)। অভিজ্ঞ ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫১) *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬) বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একটি অনবদ্য, অনন্য ও যুগান্তকারী সংযোজন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস-তীরবর্তী অঞ্চলের দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, পরিশ্রমজীবী, সংগ্রামশীল, ধীবর সম্প্রদায় তথা মালোপাড়ার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিরাশা-হতাশা, শ্রম-বিশ্রাম, সংকীর্ণতা-ঔদার্য ঋদ্ধ জীবনকাঠামোকে এ উপন্যাসে শিল্পরূপ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের আন্তরশক্তি গঠনের অন্যতম সক্রিয় উপাদান হলো ভাষা। এ উপন্যাসের ভাষাতেও আছে একই সঙ্গে স্থানিকতা ও প্রবহমানতার সুর। এখানে 'উপন্যাসের ভাষায় এসেছে কখনো জীবনের জন্য গভীর আকর্ষণের সুর, কখনো বা উদাসীনতার গৈরিক রঙ' (বিশ্বজিৎ, ২০১২ : ১৪৬)। *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে এ ভাষা অনন্য হয়ে উঠেছে প্রবাদ প্রবচন ও বাগধারা সংযোজনে। লেখকের জটিল মনস্তত্ব বা অন্তরগত বিষয় প্রকাশের উপায় হলো প্রবাদ প্রবচন। কারণ এতে বাহ্যিক ও অন্তরগত বিষয় থাকে। একাধিক পরিবেশে যেমন প্রবাদ-প্রবচনের উপস্থিতি রয়েছে, তেমনি একাধিক অর্থে প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। লোকজীবন বা কৌমজীবনের মানুষের কণ্ঠস্বর যেন প্রবাদ-প্রবচনে প্রতিভাত হয়। কখনো কখনো একাধিক পরিবেশ ও প্রতিবেশে এর উপস্থিতি

* লেকচারার, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

এবং একাধিক অর্থে ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কেননা লোক জীবনের বা কৌম জীবনের কণ্ঠস্বর হিসেবে মূলত প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগ হয়। প্রবাদ প্রবচন ও বাগধারার ন্যায় স্বল্পায়তনিক ফর্মে উদ্ভাসিত হলো তিতাস পারের মালোদের সংসার ও সমাজের ভাবৈশ্বর্য, মালোদের মনের আবেগ, অনুভূতি ও জীবনের সমাচার। প্রকাশ পেল প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারার মতো সংক্ষিপ্ত, সংহত অথচ লিরিক্যাল ভঙ্গিমায়। উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রতিটি প্রবাদ প্রবচন ঔপন্যাসিকের এক একটি মনোভাবনার ইঙ্গিতবহ। ঔপন্যাসিক ভাষা ব্যবহারে বিশেষত প্রবাদ প্রবচন ও বাগধারা প্রয়োগে যে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রবাদ প্রবচন ও বাগধারা বিশেষ নয়, নির্বিশেষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। বর্তমান প্রবন্ধে *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের একটি বিশেষ দিক প্রবাদ প্রবচন বিশ্লেষণই আমাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে। বর্তমান প্রবন্ধে তিতাস একটি নদীর নাম-এর সাথে সমসাময়িক কালে রচিত অন্যান্য উপন্যাসের তুলনামূলক বিচার এবং ঔপন্যাসিকের অন্যান্য রচনার বিষয়াদি তুলে ধরার সাথে উপন্যাসে অভিব্যক্ত বিষয় ও ভাষাগত যে বাগর্থতাত্ত্বিক তাৎপর্য রয়েছে তা এই সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচন ও বাগধারা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিরূপণ করা হবে। অর্থাৎ উপন্যাস ও প্রবাদ প্রবচনের সম্পর্ক ও প্রবাদ প্রবচন ও বাগধারা ব্যবহারে *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসটি ভাষাগত সৌকর্যে শিল্পান্বিত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ বিবেচনা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

উপন্যাসে লক্ষ করা যায় যে, একটি বিশেষ ভাষাগত দিক তথা প্রবাদ প্রবচন ও বাগধারাকে অবলম্বন করে ঔপন্যাসিক মালোপাড়ার তথা জেলেদের জীবন ব্যবস্থা এবং জীবনের গূঢ়ার্থকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মালোদের কর্ম, সংসার, উৎসব, মানবীয় সম্পর্ক, প্রেম, বিরহ ও দুঃখ উন্মোচন ও প্রকাশই ঔপন্যাসিকের ভাবনা জগতের শিখরদেশে স্থিতি পেয়েছে। মালোদের প্রথমে ঐক্য ও সম্প্রীতি এবং যাত্রাদলের আবির্ভাবে আত্মসম্পর্কের ভাঙন ও শোচনীয় মৃত্যু ও তিতাসের শুকিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মালো সমাজের ধ্বংসপ্রায় রূপই উপন্যাসটিকে কালোত্তীর্ণ তুলেছে। এসবের পাশাপাশি ভাষাগত বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা এর চিরায়ত মূল্যমানের আরেকটি কারণ। কেননা ঔপন্যাসিক যখন মালোজীবনের আখ্যান স্বরূপ এ উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন তিনি তখনই বোঝেন যে জেলে সমাজের স্বতন্ত্র প্রকৃতির উৎসস্থলই ভাষা। সেই সমাজে মানুষের মুখ হতে নিঃসৃত হয় অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন। ঔপন্যাসিক এমনই মোহনীয়, পরিচ্ছন্ন, লাবণ্যময়, ভাব-প্রকাশোপযোগী জীবনের বিশেষত্ব বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশোপযোগী অপেক্ষাকৃত সরল ও লোকজ, সর্বজন পরিচিত প্রবাদ প্রবচনের সাহায্যে উপস্থাপন করেছেন যে সহসা যেন পাঠক সম্মুখে ওই ব্যতিক্রমী দৃশ্য ভেসে ওঠে। কেননা উপন্যাসে যে প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারার প্রয়োগ লক্ষ করা যায় তার কতকগুলো গ্রাম্য প্রবাদ, কোনো প্রবাদ সংলাপধর্মী, কোনোটা প্রমিত ভাষা বৈশিষ্ট্য

সম্পন্ন, আবার কোনোটা পদ্যধর্মী বা ছন্দোবদ্ধ। প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার বিষয়ে ঔপন্যাসিকের সচেতনতা, পরিপক্বতা, ও দক্ষতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন তাই এর শিল্পসাকল্যের একটি আকর্ষণীয় অনুষঙ্গ, যা নিয়ে সুচিন্তিত বিবেচনার অবকাশ রয়েছে। *তিতাস একটি নদীর নাম* এ প্রবাদ প্রবচন ও বাগধারার নান্দনিক ব্যবহার বিষয়ে গভীর অভিনিবেশ বর্তমান প্রবন্ধের মূল প্রেরণা।

২. তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের প্রেক্ষাপট

অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* সমাজের প্রান্তবর্তী ব্রাত্য যূথবদ্ধ মালো বা জেলে জীবনের রচনা। তিতাস তীরবর্তী কৃষক-পল্লির জীবনবাস্তবতাও অসাধারণ নৈপুণ্যে অঙ্কিত হয়েছে এ উপন্যাসে। 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ নদী ও মৃত্তিকালালিত নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনের সামূহিক জীবনের খণ্ড-অখণ্ড রূপ মিলিয়ে এক পূর্ণবৃত্ত জীবন নির্মাণ করেছেন তাঁর উপন্যাসে।' (রফিকউল্লাহ, ১৯৯৭ : ৩০)। কেন্দ্র থেকে দূরে থাকায় এদের জীবনযাত্রা, আবেগ ও ইচ্ছাগুলো ছিল সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত। তাই তাদের প্রকাশের পথ হয়েছে নিজস্ব ও নান্দনিক এইসব প্রবাদ-প্রবচনে মালোদের জীবনযাত্রা যেমন সংঘাতে, সংস্পর্শে ও সমন্বয়ে উদ্দীপ্ত হয়েছে, তেমনি উদ্ভাসিত হয়েছে তাদের লোকজ ও গ্রাম্য আচরনগত ও ভাষাগত দিক।

উপন্যাসে যুক্ত বিশেষ শিল্পগুণ: কাহিনি, চরিত্র, ভাষা-উপভাষা ও জীবনদর্শনের মিলিত দ্যোতনায় এই শিল্প হয়ে ওঠে শিল্পিত। বর্ণনা, বিবৃতি, চিত্রময়তা প্রভৃতির পরতে পরতে ঔপন্যাসিক অনুভাবনা যোজিত করেন বিশিষ্ট ভাষা বয়নরীতিতে। কোনো একটি বিশেষ গুণ বা গুণের সমাহার উপন্যাসে সংযুক্ত করতে পারে কালোত্তীর্ণ ধ্রুপদী স্বভাব। কালোত্তীর্ণ মহিমা নিয়ে অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* বহুপঠিত উপন্যাস; যদি কালজয়ী বলে স্বীকার করে নেই, তাহলে খতিয়ে দেখা দরকার কোন বিশেষ দিকের সমন্বয়ে গঠিত এই উপন্যাস।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে অদ্বৈত কুমিল্লা জেলার তিতাস নামক নদীতীরের ধীবর তথা জেলে ও মৎস্যজীবীদের জীবনযাপন, রীতিনীতি ও ধর্ম-সংস্কারের অনবদ্য কাহিনি তুলে ধরেছেন। সামাজিক ও আর্থিক দিকের পরিবর্তনের ফলে এই সমাজের বুকে যে বিপর্যয়ের ঢেউ লাগল, তাতে প্রকৃতির খেয়ালে একদিন তিতাসের ধারা শুকিয়ে গেল, সেই সঙ্গে শীর্ণ হয়ে এল ধীবর সম্প্রদায়ের জীবন; এরই যথার্থ প্রতিফলন আছে উপন্যাসে। সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তনের মহাকাব্যিক বিস্তার এই উপন্যাসে লক্ষণীয়। গ্রন্থাকারে *তিতাস একটি নদীর নাম* যেভাবে পাওয়া গেছে, তাতে আছে চারটি খণ্ড; প্রতিটি খণ্ডে রয়েছে দুটি করে পর্ব। প্রথম খণ্ডের পর্বদ্বয়ের নাম 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও 'প্রবাস খণ্ড' । দ্বিতীয় খণ্ডের পর্বদ্বয় হচ্ছে 'নয়াবসত' ও 'জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ'। তৃতীয় খণ্ডে আছে 'রামধনু' ও 'রাঙা নাও' আর চতুর্থ খণ্ডে 'দুরঙা

প্রজাপতি ও 'ভাসমান'। তিতাস নদীবক্ষে মৎস্যজীবীদের জীবন-সংগ্রামের কাহিনি *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসের মৌল বিষয়। নদীর সঙ্গে ধীবর শ্রেণির জীবনের সম্পর্ক যে কত ব্যাপক, গভীর ও বিচিত্র হতে পারে অদ্বৈত মল্লবর্মণের এ উপন্যাসে তা উন্মোচিত হয়েছে। ধীবর শ্রেণির জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-ভালোবাসা অর্থাৎ জীবনসত্য এ উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। এখানে তিতাস নদী ও জেলেদের জীবন একাকার হয়ে গিয়েছে। তিতাস জেলেদের জীবনীশক্তির প্রধান উৎস। শুধু তাই নয়, মৎস্যজীবীদের বাঁচা-মরা দুটি বিষয়ই নিয়ন্ত্রণ করেছে এই নদী।

মালোপাড়ার জেলেরাই এখানে কেন্দ্র ও পরিধিজুড়ে সঞ্চারণশীল; তারাই উপন্যাসের চালিকাশক্তি, আবার ট্রাজিক পরিণতির শিকার। তাদের এ জীবনের রূপ প্রবাহিত, পরিস্ফুট ও প্রকাশিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের নিখুঁত ও সূক্ষ্ম ভাষা বর্ণনার মাধ্যমে। আর এ ভাষার অনন্য উপাদান প্রবাদ প্রবচন ও বাগধারাসমূহ। ঔপন্যাসিকের প্রবাদ প্রবচন চয়ন ও ব্যবহারে যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি প্রকৃতি প্রাণের সম্মিলনে গড়ে-ওঠা তাঁর নিজস্ব লেখনীশৈলী পাঠককে মুগ্ধ করে। এ উপন্যাসের কাহিনির অধিকাংশ জুড়ে আছে মাছ, নৌকা, নদী, জেলেপাড়া ও মালোজীবন। এ উপন্যাসের অনন্য চরিত্র বাসন্তী ও অনন্ত হচ্ছে মুক্ত প্রাণ, সংগ্রামী, বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন ও অধিকারবোধের দ্যোতক। তিতাস তীরবর্তী জনগোষ্ঠীর লোকায়ত জীবন ও প্রান্তিক সংস্কৃতি আলোচ্য উপন্যাসটিতে নিয়ে এসেছে ভিন্ন এক মাত্রা। লোকবিশ্বাস আর লোকায়ত সংস্কৃতির কুশলী উপস্থাপনা তিতাস তীরের ভিন্ন এক বাস্তবতার পরিচায়ক। ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, লোকছড়া, লোকক্রীড়া এসব নিয়েই লোকসংস্কৃতির জগৎ বিস্তৃত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে লোকসংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রবাদ-প্রবচন।

তিতাস যেমন ধীবর শ্রেণির বেঁচে থাকার অবলম্বন, তেমনি এর প্রতিকূলতা তাদের নিঃস্ব করেই তৃপ্ত হয় না, জীবন পর্যন্ত কেড়ে নেয়। এসবের বাইরেও রয়েছে মাছ পাওয়ার মনস্তাত্ত্বিক চাপ, সব সময় এ চাপের মধ্যে থাকতে হয় তাদের । দিন-রাত অমানুষিক পরিশ্রমের পর আশানুরূপ মাছ ধরতে না পারলে মালোদের শরীর-মন দুই-ই ভেঙে পড়ে। তখন বাধ্য হয়ে তারা চড়া সুদে টাকা ধার করে; জীবনকে আরো ঋণগ্রস্ত করে তোলে। এ সবের পরও জেলেদের তিতাসে না এসে উপায় নেই। কেননা এখানেই তাদের বাঁচা-মরা অপেক্ষা করে। তিতাস শুকিয়ে যাওয়ার ফলে মালোপাড়ায় দুর্যোগ ও দুর্ভোগ নেমে আসে তবুও তাদের মনে জেগে থাকে বেঁচে থাকার আশা। জীবনদর্শনের এই স্তরান্তর স্বতঃস্ফূর্ত ও সাবলীল। ফলে তা বিশ্বাস্য ও নান্দনিক। ব্রাত্য সমাজ-পটে স্থাপিত লোকায়ত জনজীবনের রক্তার্দ্র-হৃদয়ে মালোদের আত্মার হার্দিক সংকট ও অনন্তের শিক্ষিত হয়ে সংকট নিরসনের এবং বাসন্তীর সদর্থক জীবন বিশ্বাসে উত্তরণের নান্দনিক অঙ্গসংস্থানই *তিতাস একটি নদীর নামে*'র সৌন্দর্য ও বৈভব।

প্রান্ত-সমাজ ও তাদের সংস্কৃতি ও জীবনের প্রতি অদ্বৈত মল্লবর্মণের যে গভীর ভালোবাসা আছে তা শুধু *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসেই প্রকাশ পায়নি, তাঁর আর সব প্রধান রচনাতেত্ত আমরা প্রত্যক্ষ করি এ সত্যতা। অদ্বৈত মল্লবর্মণের রচনা নিয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেন 'ভ্যান গগের জীবন নিয়ে লেখা আরভিং স্টোনের *লাস্ট ফর লাইফ* উপন্যাস অদ্বৈত যে *জীবনতৃষা* নামে অনুবাদ করেন, কিংবা *ভারতের চিঠি-পার্ল-বাককে* নামের যে পত্র-উপন্যাস লেখেন, অথবা তাঁর *রাঙামাটি* বা *শাদা হাওয়া* উপন্যাস সর্বত্রই আছে প্রাকৃত জীবন ও কৌম-সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভালোবাসা। স্টোনের *লাস্ট ফর লাইফ*-এও আছে জেলেপাড়ার বাস্তবতা, যেমন আছে *তিতাস একটি নদীর নাম-এ*।' (বিশ্বজিৎ, ২০১২ : ১২৭)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে রচিত *শাদা হাওয়া* উপন্যাসে বিশ্বরাজনীতির সার্বিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। নগর সম্পর্কিত ধারণা এবং গ্রামের উন্নয়ন বিষয়ক অদ্বৈত মল্লবর্মণের ভাবনাগুলো স্থান পেয়েছে *রাঙ্গামাটি* উপন্যাসে। গ্রামের উন্নতি ব্যতিরেকে একটি দেশের উন্নয়ন সম্ভবপর নয়, এই সত্য উপলব্ধি করে দূরদর্শী ঔপন্যাসিক উর্ধ্বশ্বাসে শহরমুখি শিক্ষিত সমাজকে গ্রামে ফিরে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর নগরজীবন সম্পর্কিত ভাবনার বহিঃপ্রকাশ *রাঙ্গামাটি* (১৯৯৭) আর রাজনীতিচেতনার অভিজ্ঞান *শাদাহাওয়া* (১৯৯৬)। এছাড়া 'তাঁর সৃষ্টিকর্মের মাঝে আছে *সন্তানিকা* (১৩৪৫), *কান্তা* (১৯৯৬), *বন্দী বিহঙ্গ* (১৩৫২) *স্পর্শদোষ* (১৩৪৭) প্রভৃতি ছোটগল্প, প্রতিবেদনধর্মী রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *ভারতের চিঠি পার্লবাক্‌কে* (১৯৪৩)। এছাড়াও রয়েছে আরভিং স্টোনের বিখ্যাত উপন্যাস *লাস্ট ফর লাইফ* এর অনুবাদ *জীবনতৃষা*। তাঁর রচিত কিছু কবিতা এবং প্রবন্ধ নিবন্ধেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। (শান্তনু, ১৯৮৭ : ৭)।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। সমকালে লিখিত অসংখ্য রচনার সাথে *তিতাস একটি নদীর নাম* তুলনীয়। মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ জীবনের রাহুসদৃশ ক্ষুধা যন্ত্রণা এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নির্যাতিত নারীর সংগ্রামের অসাধারণ আলেখ্য *সূর্যদীঘল বাড়ী* (১৯৫৫) রচনা করেন আবু ইসহাক। আর শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম তাঁর শৈশব- কৈশরের সার্বক্ষণিক সঙ্গী নদ-নদী পরিবৃত দক্ষিণবঙ্গের ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সেই অঞ্চলের মানুষ ও আবহমান লোকঐতিহ্যের আবহে সৃষ্ট জীবন-প্রবাহকে সমগ্রতা অন্বেষী শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন *কাশবনের কন্যা* (১৯৫৪) উপন্যাস । অসংখ্য রচনার মধ্যে অভিজ্ঞতায়, বর্ণনায় ও উপস্থাপনায় অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* অনন্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

প্রসঙ্গত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নদীকেন্দ্রিক জনপ্রিয় উপন্যাস *পদ্মানদীর মাঝি*, হুমায়ূন কবিরের *নদী ও নারী* সমরেশ বসুর *গঙ্গা*, বিভূতিভূষণের *ইছামতি* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'নদীজীবন আশ্রিত উপন্যাসের পাঠকৃতিতে ব্যবহৃত চিহ্নসমূহের সংহিতা-কাঠামোর মধ্যে বিকশিত হয় বিশেষ কোনো নদীবেষ্টিত ভূগোলের অন্তর্গত

মানবানুভূতি, তাদের টিকে থাকার সংগ্রামের অনিঃশেষ অন্তর্লীন বৈচিত্র্য। বাংলা সাহিত্যে এরূপ বিশেষত্বের তিনটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন *পদ্মানদীর মাঝি, তিতাস একটি নদীর নাম* এবং *গঙ্গা*।' (সৈয়দ শাহরিয়ার, ২০০৮ : ২৬৬) অন্য ঔপন্যাসিকদের সাথে অদ্বৈত মল্লবর্মণের পার্থক্য এই যে, তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার কারণে তিনি মৎস্যজীবীদের সঙ্গে নদীর গভীর সম্পর্ক ও প্রভাবের বিষয়টিকে সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি আনুবীক্ষণীয় দৃষ্টি দিয়ে জেলে সম্প্রদায়ের জীবনকে দেখেছেন। ফলে তাদের গোটা জীবনই উপন্যাসে উঠে এসেছে। তাঁর নিজস্ব অভিমতে এ সত্যতা স্পষ্ট। 'সহচর সুবোধ চৌধুরী তাঁকে বলেছিলেন, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন *পদ্মানদীর মাঝি*, আর কি তোমার বই মানুষ নেবে? বন্ধু সুবোধ চৌধুরীর এ প্রশ্নের উত্তরে ছন্ন-ছাড়া নিম্নবর্গের ভিটে-মাটি থেকে উঠে আসা অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন- 'সুবোধ' দা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় artist, master artist; কিন্তু বাওনের পোলা রোমান্টিক। আর আমি তো জাউলার পোলা।' (সূত্রঃ বিশ্বজিৎ, ২০১২ : ১২৬)

অদ্বৈতের অভিজ্ঞতা মানিকের মতো আহরিত নয়, বরং তিনি তো কৌম-অভিজ্ঞতার শরিক। তিনি কৌমজীবনের বাস্তবতাকে আর্থ-সামাজিক প্রবণতা ও জীবনবীক্ষণের গভীরতর স্তরে সঞ্চারিত করেছেন, কিন্তু কৌমজীবনকে বিস্মৃত হয়ে তিনি ব্যক্তির অবচেতন আকাঙ্ক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। নিম্নশ্রেণির স্বপ্ন ও সংগ্রামকে এবং বর্গ বিভাজিত সমাজে মধ্যবিত্তের প্রেমবিলাসকে শব্দরেখায় ধারণ করেছেন অদ্বৈত। জেলের সন্তান মল্লবর্মণ জল ও জীবনের প্রতিবেদন রচনার এবং নিম্নবর্গের ভাবাদর্শকে শিল্পিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। সন্দেহ নেই, *তিতাস একটি নদীর নাম* বিভিন্ন কারণে নদীমাতৃক বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় অর্জন করেছে বিশিষ্টতা আর নিম্নবর্গের শিল্পভাষ্যকার হিসেবে অদ্বৈত অর্জন করেছেন বিরলখ্যাতি।

প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা গড়ে ওঠে দীর্ঘ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং মানুষের অভিজ্ঞতার আলোকে। যার প্রকাশভঙ্গি সরল, নিটোল ও রূপকধর্মী। মানুষের সাধারণ চেতনা অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক একটি সত্যভাষণ প্রবাদ প্রবচন, যার অভিব্যক্তি সংক্ষিপ্ত। নীতি ও উপদেশ বিতরণ এর লক্ষ্য। কেননা 'জীবন ও সমাজ সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা এবং ভাষা-সংহতির ঐশ্বর্য সাহিত্যিক প্রবাদ প্রবচনের মূলে' (অমরেন্দ্র, ২০০৯ : ৬৬)। প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা ভাবদ্যোতক ও অর্থবহ। উপন্যাসের কাহিনিকে পরিস্ফূট, ত্বরান্বিত, গতিশীল করতে অনেক সময় সাধারণ বাক্য যোজনার পাশাপাশি বিষয়ানুগ প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার হয়ে থাকে। কোন প্রাচীনকালে কার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে প্রবাদের প্রথম সৃষ্টি তার সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে প্রবাদের ব্যবহার যুগ যুগ ধরে আবেদন ও উপযোগিতা প্রমাণ করে চলেছে। *তিতাস একটি নদীর নামে* যে প্রাসঙ্গিক ও বৈষয়িক এবং সঙ্গত প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার রয়েছে তাতে আছে জ্ঞান ও সত্য প্রচার এবং কাহিনিকে গতিশীল করার প্রচেষ্টা, আছে বক্তব্যকে রসাত্মক করে প্রকাশ করার জন্য সংযত শব্দবিন্যাস।

চর্যাপদের এগার শতকের কবি ভুসুকুপা প্রবাদ ব্যবহার করেছিলেন 'আপনা মাসে হরিনা বৈরী'। এরপর প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক কবি এবং আধুনিক যুগের বহু সাহিত্যিক এধরনের প্রবাদ ব্যবহার করেন। সুতরাং বলা যায় যে বাংলা সাহিত্যের সাথে প্রবাদ প্রবচনের সম্পর্ক সুপ্রাচীনকাল হতে। দীর্ঘ সময় ব্যবধানে প্রবাদের কাঠামো, ভাব ও অর্থের যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এমন নয়। যেমন একটি প্রবাদ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় প্রায় অক্ষয়, অব্যয়, অভঙ্গ অবস্থায় পাওয়া যায় :

পিপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে। (কৃত্তিবাস)
কিবা মৃত্যু হেতু পাখ উঠে পিপিড়ার। (মুকুন্দরাম)
পিপীলা পালক বাঁধে মরিবার তরে। (মানিক গাঙুলী)
পিপীলিকার পাখ দক্ষ মরিবারে উঠে। (রামেশ্বর)
(সূত্রঃ ওয়াকিল আহমদ, ২০০৭ : ১৮)

একই প্রবাদ আমরা বিংশ শতকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৪৬-৪৭) উপন্যাসে দেখতে পাই 'পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে'। অর্থাৎ পিপীলিকা, পাখা উঠা এবং মৃত্যু প্রবাদটির কাঠামোগত উপাদান কবিতার ছন্দের জন্য স্থান বদল হয়েছে মাত্র।

৩. বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ প্রবচন

বাংলা কথাসাহিত্যে প্রবাদ প্রবচন উপস্থাপিত হয়েছে গভীর মমতায়, বিশ্লেষিত হয়েছে শিল্পঘন বিবেচনায়। প্রগাঢ় মানব-অনুধ্যানের আশ্চর্য ক্ষমতায় কথাসাহিত্যিকগণ গড়ে তোলেন ছাঁচহীন এক শিল্পলোক, ব্যবহার করেন বিচিত্র নান্দনিক কৌশল; প্রবাদ প্রবচন ও বাগধারা এর মধ্যে অন্যতম। প্রবাদ প্রবচনে ঔপন্যাসিকেরা যেন ঋদ্ধ মননের নিবিড় প্রযত্নে তাদের উপন্যাসে জীবনবৃক্ষের মর্মমূল স্পর্শ করেন। রূপক-প্রতীকের দ্যোতনা সৃষ্টিতে, ইঙ্গিতময়তা আনয়নে, মানব মনের গহীনতলকে স্পর্শ করতে, কখনোবা পরিনতি প্রকাশে প্রবাদ প্রবচন ব্যবহৃত হয়। প্রবাদ-প্রবচন প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক জীবন মনস্তত্বের সঙ্গে অন্বিত হয়ে ভিন্নতর আবেদনের শিল্পরূপ হয়ে এসেছে বাংলা সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেই প্রথম এর যথার্থ ব্যবহার দেখা যায়। মানবজীবন ও সম্পর্কের নানাবিধ জটিলতা, টানাপোড়েন, দ্বিধাহীনতা, দোলাচলবৃত্তি, অসহায়ত্ব ও চিরায়ত বাঙালির স্বভাবকে বঙ্কিমচন্দ্র *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসে এক অনন্য শিল্পচেতনায় নির্মাণ করেন নিজস্ব অনুভব দক্ষতায় —

> নবকুমার জানিতেন না যে, বাঙ্গালী অবস্থার বশীভূত, অবস্থা বাঙালীর বশীভূত হয় না। জানিলে এ দুঃখ করিতেন না। (বঙ্গিমচন্দ্র, ২০০৬ : ৪৬)

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে নবকুমার অন্যকে সাহায্য করতে গেলে তাকেই বিপদে ফেলে চলে যায় সবাই। নির্মম বাস্তবতা ও অনিবার্য বিপর্যয়ের সামনে নবকুমারের নিঃশব্দ,

নিঃসহায় আত্মসমর্পণকে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন প্রতীকায়িত করেছেন, তেমনিভাবে দীক্ষা দিয়েছেন মানবভাবনা, মানবীয় মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা, মানবধর্ম ও পরোপকার সম্পর্কে —

> আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে-কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন? (বঙ্কিমচন্দ্র, ২০০৬ : ৩৭)

প্রবাদ লোক অভিজ্ঞতার ফসল, প্রবচন ব্যক্তিগত মনীষার সৃষ্টি। লেখক কখনোও লোকজ বা গ্রাম্য এবং প্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করেন আবার কখনো পারিপার্শ্বিকতা, অভিজ্ঞতা ও জটিল মনস্তত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটান যা প্রবচন বলে পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়। লেখকের ভাষারীতির দিকে একটু মন দিলে ঠিক এই ধারণাটিই তৈরি হয় যে, প্রবচন তারা ব্যবহার করেছেন বাস্তবকে শান দেবার পাথর হিসেবে যাতে বাস্তব পাতলা হয়, সূক্ষ্ম হয়, আগুনের মতো উজ্জ্বল তপ্ত হয় আর তাতে দেখা দেয় ক্ষুরের ধার। বাংলায় ভারতচন্দ্র রায়, মাইকেল মদুসূদন দত্ত প্রমুখ অনেক অনেক সাহিত্যিকের রচনার কোনো কোনো অংশ প্রবচনে পরিণত হয়েছে। প্রবচনের এ রকম কিছু নিদর্শন: 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনি' (কাশীরাম দাস), 'কড়িতে বাঘের দুধ মিলে' (ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর), 'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' (সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়), 'একে মানসা তায় ধুনোর গন্ধ' (মাইকেল মধুসূদন দত্ত), 'যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙালি' (মাইকেল মধুসূদন দত্ত), 'পান্তা আনতে লবণ ফুরায়' (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়), 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'জাতের নামে বজ্জাতি' (কাজী নজরুল ইসলাম)

প্রবাদ-প্রবচন লেখকের অভিপ্রায়, তাঁর আবেগ, তাঁর চিন্তাবিশ্লেষণ, জগৎ-ভাবনা সাহিত্যের ভাণ্ডারে মাত্র একবারই সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারে কোনোরকম প্রতিতুলনা না রেখে। ফলে কাহিনি তখন একটা বর্ণনীয় বিষয়মাত্র থাকে না, তা হয়ে ওঠে জীবন্ত, স্পন্দমান, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে অন্তহীনভাবে সম্ভাবনাময়। জীবন ও জগৎকে শওকত ওসমান যেমন বহুকৌণিক ফর্মের মধ্যে রূপাবয়ব দান করেছেন তেমন প্রবাদ প্রবচন ব্যবহারে এনেছেন বহুরূপতা। একদিকে হাহাকার-নিরাশা-ব্যর্থতা ও অনিবার্য মৃত্যুর পাঁয়তারা অন্যদিকে লোভ-আমোদ-বিলাসিতা এই বৈপরীত্যে সূচিত হয়েছে মানবজীবনের চরম কূটাভাস। *ক্রীতদাসের হাসি* উপন্যাসে একদিকে অনাচার-অত্যাচার-শোষণ এবং অন্যদিকে শোষক হারুন-অর-রশিদের আমোদ-রঙ্গরসের মূলে যে রয়েছে দিরহাম বা অর্থ তা অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে হারুন-অর-রশীদের সংলাপে —

> তুমি জানো, দীরহামের মোজেজা। (অলৌকিক) শক্তি আছে। দীরহাম অঘটন-ঘটন পটীয়সী (শওকত, ২০০০ : ৩৪৮)

মূলত, শওকত ওসমানের মানসপটে সর্বদা ক্রিয়াশীল ছিল সর্বহারা, অসহায়, নিম্নবৃত্তের জেগে উঠার ও তাদের স্বপ্ন পূরণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। আর এই চিন্তা বাস্তবায়নের জন্যেই কলম ধরেছিলেন তিনি। *জননী* উপন্যাসে লোক ঠকানোর কৌশল গহর শিখতে বলছে আজহারকে। বহুরৈখিক জীবন বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিসাধকের ন্যায় ব্যবহৃত প্রবাদ অনুষঙ্গ কেবল জীবনের, সমাজের নঞর্থকতাকেই প্রকটিত করেনি; জীবনের সার্থকতা, ইতিবাচকতাও এতে ব্যঞ্জিত হয়েছে —

> তখন গহর সহাস্যে আবার বলিতে থাকে, বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দাও, খাঁয়ের পো। বড় কঠিন ঠাঁই দুনিয়াটা। (শওকত, ২০০০ : ২০৭)

'সময় পেলেই ফলেন পাপ, পাপ জানে না আপন বাপ' প্রবাদটি যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসে পাওয়া যায় তেমনিভাবে একটু ভিন্নরূপে পাওয়া যায় আবু ইসহাকের *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসেও 'পাপ খাতির করে না পাপের বাপকেও'। এছাড়া *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসে ব্যবহৃত আরও কিছু প্রবাদ প্রবচন- 'সৎসঙ্গে কাশীবাস, 'অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'; 'পেটে ভাত নাই ধরমের উপোস'; 'গায়ে মানে না আপনি মোড়ল'। এসব প্রবাদ প্রবচন উল্লেখের মাধ্যমে কাহার পল্লির মানুষদের বিশ্বাস ও ভুয়োদর্শনকেই যেন তুলে ধরতে চেয়েছেন তারাশঙ্কর। আবু ইসহাক *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসেও প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসের ভাষার লোকায়ত জীবনকে অঙ্গীকারের আকাঙ্ক্ষা থেকেই বোধহয় লেখক এত বেশি প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন উপন্যাসে। কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রবাদ ব্যবহারে আবু ইসহাক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য কিছু প্রবাদ-প্রবচন এরকম- 'লাডি যার মাডি তার'; 'চরের বাড়ি মাটির হাড়ি, আয়ু তার দিন চারি'; 'পঁচা শামুকেও পা কাটে'; 'সিধা আঙুলে ঘি উঠব না'; 'জোর যার মুল্লুক তার'। সমরেশ বসুর *গঙ্গা* উপন্যাসটির বিভিন্ন জায়গায় লেখক ঘটনাকে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার স্বার্থে উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন প্রবাদ ও বাগধারার। 'গুড়ে বালি', 'শিয়রে সংক্রান্তি' প্রভৃতি বাগধারার পাশাপাশি প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করা হয়েছে উপন্যাসের বিভিন্ন অংশের সঙ্গতি রক্ষার্থে । যেমন- 'ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না'; 'নানা মুনির নানা মত'; 'বাইরে কোঁচার পওন, ভেতরে ছুঁচোর কেওন'; 'যদি বর্ষে আগনে, রাজা যায় মাগনে' ইত্যাদি। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর উপন্যাসে ভাবকে প্রমূর্ত করতে ব্যবহার করেছেন প্রবাদ প্রবচন । *খোয়াবনামা* উপন্যাসে ভাত যে বাঙালির প্রধান অন্ন এবং দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত মানুষের কাছে একমুঠো ভাত যে কত গুরুত্ববহ, প্রয়োজনীয় ও কাঙ্ক্ষিত তা তমিজের বাপের ভাতের সানকিতে কুলসুমের পা লেগে খানিকটা ভাত মাটিতে পড়ে গেলে তমিজের সংলাপে বোঝা যায়, যেখানে শোকের সঙ্গে তীব্র ক্ষোভের প্রকাশ পেয়েছে।

> মুখের রন্ন তুমি পাওদিয়া ঠেলো? লক্ষ্মীর কপালেত তুমি লাথি মারো? কেমন মেয়েমানুষ গো তুমি? (আখতারুজ্জামান, ১৯৯৬ : ১৯)

প্রথাগত সমাজ ও ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে মানবীয় আবেগ অনুভূতির যে মূল্যহীন, মূলত সেটি উদ্ভাসিত করাই ছিল কমলকুমারের অন্বিষ্ট। শাসকবর্গের আগ্রাসন ও কূটকৌশলে সৃষ্ট নানামাত্রিক সমস্যা-সংকট, রিরংসাবৃত্তির অসঙ্গত ক্লেদাক্ত রূপ, মানব-মনস্তত্ত্বের বহুবিধ জটিলতা ও মানব মূল্যবোধের অপচয়, বিপর্যস্ত নারীমনের অবস্থা, পুরুষতন্ত্রের কপটতা, ব্রাত্য-অন্ত্যজ শোষণের ইতিবৃত্ত প্রভৃতির পরিবেশনায় প্রবাদের প্রয়োগ শিল্পের আধারেই প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে কমলকুমারের *অন্তর্জলী যাত্রা* উপন্যাসে। গতরক্যাঙলা বৈজুর হাতে কত লোকের শবদেহ ঠেকা খায়, তার কোনো দরদ নেই, কিন্তু জ্যান্ত কেউ পুড়বে তা সে ভাবতে পারে না। বৈজুর দুঃসহ সন্তাপ, অভিতাপ, উপতাপের ইঙ্গিত দেয় সে যশোবতীকে আবেদন করে —

> ওঁগো বাবু আমি ভাবের পাগল নই — আমি ভবের পাগল। তুমি পুড়বে চচ্চড় করে...ভাবতে আমার চঁড়ালের বুক ফাটছে গো...তুমি পালাও না কেনে। (কমলকুমার, ২০১৩ : ১৪৫)

ভাষাই যাঁর প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন সেই লেখক মানুষটি যখন জনগণের সম্পত্তিকে নিজের মতো তৈরি করে নিতে গিয়ে যথাশক্তি নিয়োগ করেন, তখন ভাষা ব্যক্তিত্বের ধাঁচের সঙ্গেই লগ্ন হয়ে যায়, তখন আধেয়কে বহন করা, তাকে রূপ দেওয়াই লেখকের নিজস্ব ভাষারীতির মূল লক্ষ হয়ে ওঠে। শব্দ বাছাই, বাক্য তৈরি, বাক্যের মধ্যে শব্দগুলি বসানোর ক্রম, বাক্যাংশগুলির পারস্পরিক সংস্থান এবং সম্পর্ক স্থাপন এইসব বিবেচ্য হয়ে ওঠে। প্রবাদ ব্যবহারে ভাষা স্বচ্ছন্দ, সাবলীন ও সহজ হয়ে উঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তারাশঙ্করের বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা, মত, অবস্থা, দৃষ্টি, দীক্ষা এসবই প্রতিফলিত হয়েছে *ধাত্রীদেবতা* উপন্যাসের প্রকাশরীতিতে; ভাষাভঙ্গিও শিল্পমণ্ডিত হয়েছে বিশেষত প্রবাদ প্রবচন প্রয়োগে। শশী রায়ের সাথে শিবনাথদের সম্পত্তির সংকট ও সমস্যার উদ্ভবকালে শৈলজার কথায় দাপট, প্রতাপ প্রকাশ পায়। যেখানে নারীর বিষয়-বৈভব সম্পর্কে চেতনা, সজাগ দৃষ্টি ও বলীয়ান রূপ ফুটে উঠে যখন সে বলে—

> আজ যে শিবনাথের মাথা হেঁট হবে, তার কি?
> বিষয় বাপের নয়, বিষয় দাপের। (তারাশঙ্কর, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ : ৮২)

৪. তিতাস একটি নদীর নাম: প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার

ওপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বাংলা সাহিত্য প্রবাদ প্রবচনের শিল্পিত উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ। অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমকালীন সাহিত্যিকদের উল্লিখিত মানস প্রবণতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং *তিতাস একটি নদীর নামের* আধারে তা প্রমূর্ত করেছেন। মূলত সুপ্রভ ও সৃজনশীল প্রতিভার দ্যুতিতে ভাস্বর তার উপন্যাসের প্রবাদ প্রবচনসমূহ। স্বতন্ত্র বাক্‌ভঙ্গি, নিবিড় সাহিত্যদৃষ্টি ও নির্মাণকলা নিয়ে আবির্ভূত হয়ে তিনি বাংলা উপন্যাসের ধারাকে করেছেন সমুন্নত, সমৃদ্ধ এবং উদ্ভাসন ঘটিয়েছেন তাঁর শিল্পীমানসের অন্তর্নিহিত বাসনার রূপরেখা। মূলত তিতাস

পারের মালোদের জীবনবাস্তবতা, জীবনসত্য এবং একান্ত ব্যক্তিক জীবনকে প্রবাদ-প্রবচনের মধ্য দিয়ে উদ্ভাসিত করাই ছিল লেখকের অন্বিষ্ট। উপনাসে প্রবাদ প্রবচন ব্যবহারে একমাত্রিক, এককেন্দ্রিক বা একঘেয়েমি উপস্থাপনা ঘটেনি আর এখানেই ঔপন্যাসিকের বিশিষ্টতা। প্রবাদ-প্রবচন তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও প্রকরণ কৌশলের ক্ষেত্রে উন্নীত হয়েছে এক সঙ্গতিপূর্ণ ঐক্য চিহ্নের ভূমিকায়। 'ঈর্ষণীয় নৈপুণ্যে অদ্বৈত মল্লবর্মণ দুই বিপ্রতীপ অথচ গভীরতর অর্থে সমার্থক চেতনাকে শব্দ ও রেখায় ধারণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি যেমন ব্যবহার করেছেন প্রবাদ প্রবচন, তেমনি ব্যবহার করেছেন অভিজ্ঞতালব্ধ প্রাকৃত মানুষের মুখের বুলি, নানা স্থানিক কৌম-শব্দ।' (বিশ্বজিৎ, ২০১২ : ১৪৬)

অনেক শব্দ প্রয়োগ করে যে ভাব প্রকাশ করা কঠিন হয়ে পড়ে অদ্বৈত প্রবাদ-প্রবচনে তা অল্প কথায় সংহতভাবে প্রকাশ করেছেন। সহজ, সারল্য ও অনায়াস অর্থবোধগম্য এবং অনাড়ম্বর ভাষায় রচিত অদ্বৈতের প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা। তাই এর অর্থ সহজেই অনুধাবন করা যায়। *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসের ভাষায় লোকায়ত জীবনকে অঙ্গীকারের আকাঙ্ক্ষা থেকেই বোধ করি লেখক অসামান্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহনকারী বিপুল পরিমাণ প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করেছেন উপন্যাসে ।

প্রবাদ-প্রবচনে আন্তর্নিহিত ভাবসত্য ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি নির্ভর করে গড়ে ওঠে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জীবনের বিচিত্র ঘটনা বা অভিজ্ঞতার আলোকে সৃষ্ট বলে ভিন্ন ভিন্ন প্রবাদ-প্রবচনে অভিন্ন ভাবসত্যের প্রকাশ দেখা যায়। প্রবাদ পদ্যাশ্রিত, ভাষাবন্ধে উজ্জ্বল সৃষ্টি। প্রবাদের সঙ্গে কবিতার খুবই মিল, কারণ কবিতার মতোই প্রবাদও তার বক্তব্যকে আমাদের কাছে যে উপায়ে পৌঁছে দেয় তা হল 'স্ট্র্যাটেজি বা স্টাইল'। অনেক সময় নিছক অ্যাবস্ট্রাকটের আকারেও প্রবাদটিকে পাওয়া যায়। সেখানে প্রবাদ উপদেশ মাত্র, তেমন কিছু কবিতা নয়। বস্তুতপক্ষে ভাষাসংগঠন, বিষয় ও কাঠামো বিচারে প্রবাদ-প্রবচনকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। সেই হিসেবে *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনকে আমরা নিচে উল্লিখিত চারটি ভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষণে উদ্যোগী হব।

১. গদ্যধর্মী প্রবাদ
২. কবিতাশ্রয়ী প্রবাদ
৩. গ্রাম্য বা লোকজ প্রবাদ
৪. প্রমিত ভাষারীতি আশ্রয়ী প্রবাদ

৪.১. গদ্যধর্মী প্রবাদ

গদ্য প্রবাদগুলিতে ছন্দ ও মিল পাওয়া যায় না, অনুপ্রাসও কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। গদ্যাশ্রিত প্রবাদ মূলত সরল ও যৌগিক বাক্যের হয়ে থাকে। *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে ব্যবহৃত গদ্যধর্মী প্রবাদে জটিলতা, বিস্তৃতি, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অদ্বৈতের

বাঞ্ছিত নয়, বরং সারল্য, সংক্ষিপ্তি, প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্যই তাঁর অভিপ্রেত। মানবচরিত্র ও মনোভাবের নিগূঢ় অংশ যে বহির্জগতের সাথে সম্পর্কিত এবং উচ্চশ্রেণি ও নিম্নশ্রেণি কখনো এক হতে পারে না, যেমনটা পারে কৃষক ও জেলে সম্প্রদায়; কাদিরের মনোভাবনায় যেন তারই প্রতিচ্ছবি—

> তাদের নিজেদের হাতে তেলকুচকুচে মসৃণ হুকা। কাদিরের জন্য বাহির করিয়া দেয় মাচার তলায় হেলান দিয়া রাখা সরু খামচাখানেক আকারের খেলো.... ওরা বড় লোক। তেলে জলে যেমন মিশেনা, তাদের সঙ্গেও তেমনি কোনোদিন মেশার সম্ভাবনা নাই। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ১০৮)

ধনী ও দরিদ্রের যে সম্পর্ক সমাজে তা যেন তেল ও জলের ন্যায়। তেল জলের মিশ্রণ যেমন সম্ভব নয়, তেমনি ধনী দরিদ্রের সমতা এবং বন্ধন যেন অসম্ভব আমাদের সমাজে। এ সমাজসত্য সম্পর্কে সচেতনতা দেখিয়েছেন অদ্বৈত। একথা ঠিক যে, ভালো ও মন্দ মানুষের মিলিত সমবায়ে নির্মিত হয়েছে গোকর্ণঘাটের ধীবরপল্লি। এখানে যেমন সংবেদনশীল মানুষ প্রচুর, তেমনি অসংস্কৃত, বিকৃত ও স্থূলরুচির মানুষও কম নয়। ছাদিরের শ্বশুর যেন সেই প্রকৃতিরই লোক যে কিনা মামলাবাজ। যার কাজ মিথ্যা মামলা সাজানো আর তার জন্যে শ্বশুরের বিছানায় বউ শোয়ায়, আর জামাইয়ের বিছানায় শাশুড়ি শোয়ায়। নিজামত মুহরি নিজেকে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বলে এবং কাদিরকে কৃষক বলে নিম্নপদ বলে ধিক্কার দেয়। বাক বিতণ্ডার এক পর্যায়ে ছাদির তার শ্বশুরকে ব্যঙ্গ করে —

> 'গরিবের বাড়িতে হাতির পাড়া পড়ুক, এও আমরা চাই না বা'জি'। বাপের হইয়া জবাব দিল ছাদির (অদ্বৈত, ২০০৮ : ১৫৯)

উচ্চ পদ ও বিত্তের লোক নিম্নপদ ও বিত্তের গৃহে আগমন ঘটলে এ প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। কখনো এ প্রবাদটি এভাবেও বলা হয় 'কাঙালের বাড়িতে হাতির পাড়া'। অন্তঃ প্রকৃতি, বহির্জ্ঞান, আজন্ম-সংস্কার, অভিজ্ঞতা, আবেগ ও প্রকাশ আকাঙ্ক্ষা জীবনের অস্তিত্বমূলদেশে মিলিত হয়ে যে সমগ্রতাবোধসম্পন্ন সংবেদনশীল সর্তক মনোভাব গড়ে তোলে, অদ্বৈতের জীবনদৃষ্টিতে সেই মনোভাবগ্রাহ্য অখণ্ড বস্তুরূপই উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রবাদের বাস্তবতার পরিস্ফূটন। মঙ্গলার বউয়ের কটূক্তি, ব্যঙ্গ বা শ্লেষাত্মক উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সুবলার বউ বাসন্তীর কণ্ঠে অনন্তের মায়ের পক্ষ হতে প্রতিবাদী সুর ভেসে উঠে —

> দশজনের বিচারে তার কথা উঠব কেনে গো! সে কি কেউর বাপের ধন সাপেরে দিয়া খাওয়াইছে, না পথের মানুষ ডাইক্যা আনছে যে দশজন তার বিচার করব। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ৬১)

অনন্তের মা যে কোনো অপরাধ করেনি, নিজের বা আপনজনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি বলে জানান দেয় বাসন্তী। অদ্বৈতের প্রবাদের আকর্ষণ ও তাৎপর্যের মূলে রয়েছে সমৃদ্ধ জীবন অভিজ্ঞতার সরল ও সংহত প্রকাশ। প্রবাদে রয়েছে গভীর অর্থব্যঞ্জকতা বা স্বল্পশব্দ প্রয়োগে গভীর ভাব প্রকাশের আশ্চর্য ক্ষমতা। এক্ষেত্রে প্রবাদের বাচনিক বা

আভিধানিক অর্থ প্রধান নয়, অভিলষিত অর্থ বা রূপক অর্থই প্রধান। আকাশে চন্দ্র উদয় হলে যেমন সকলে দেখতে পায়, তেমনি রামকেশবের পুত্র কিশোর পাগল হয়েছে এ সত্য গোকর্ণঘাট জেলেপাড়ার সকলে জ্ঞাত রামকেশব দীননাথকে যেন সেই সত্যই প্রকাশ করছে —

> রামকেশব ভাইকে হাত ধরিয়া শুনাইয়া দিল, আসমানে চান্দ উঠলে পরে লোকে জানে, আমার কিশোর পাগল হইছে বেবাক লোকেই জানে। আমি কি আর ঘুর-চাপ দিয়া রাখছি? (অদ্বৈত, ২০০৮ : ৯০)

তিতাস ও তার তীরলগ্ন কৌম জনগোষ্ঠীর জীবন অদ্বৈতের প্রবাদ প্রবচন ব্যবহারে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ব্যতিক্রমী এই প্রোজ্জ্বলতাই *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসকে এনে দেয় বিকল্প নন্দন মর্যাদা। তাঁর প্রবাদের প্রয়োগ শুধু শুদ্ধ তত্ত্বাশ্রয়ী ও চেষ্টাচালিত নয়, বরং জীবন-অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। কিশোর বিদেশ গিয়েছে তাই তার বাবা-মা আশায় বুক বেঁধেছে তার ছেলে টাকা নিয়ে আসবে, ছেলেকে বিয়ে করাবে, কিন্তু ছেলে ফিরল পাগল হয়ে ফলে বাবা-মার আশা নিরাশায় পরিণত হল —

> বাপ মনে করিয়াছিল আনিবে টাকা, সেই টাকায় বাসন্তীরে আনিবে ঘরে। কিন্তু তার বাড়াভাতে পড়িল ছাই। সে আসিল পাগল হইয়া। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ৯০)

প্রবাদের মধ্য দিয়ে মালোদের জীবন, সমাজ পরিবেশ, মননগত বিষয় সহজবোধ্য ও স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। যার ব্যবহারে ঘটনা হয়েছে গতিশীল ও চমকপ্রদ। তেলিপাড়ার এক টাকাওয়ালা লোক যুবতী মালো বউদের বে-আবরু অবস্থা দেখে প্রলুব্ধ হয় এবং রোজ যেসময় পুরুষরা বাড়িতে থাকে না সেসময় নারীদের দেখে যায়। বিষয়টি বুঝতে পেরে নিজেদের মর্যাদা রক্ষায় জোয়ান মালোর ছেলেরা তাকে হত্যা করে। এ ঘটনার প্রতিশোধ নিতে বামুন, সাহা, তেলি, নাপিত, নবজাত মিলে গোপন পরামর্শ করে। বৈঠকে প্রস্তাব করা হয় মালোদেরকে শাস্তিস্বরূপ তাদের নৌকাগুলি ভাসাইয়া, তলা ফাঁড়িয়া ডুবাইয়া দেয়া এবং মাছ ধরার জালগুলি আগুনে পোড়ানো হোক। কিন্তু সকলে মনে করল এ শাস্তি লঘু হয়ে গেছে —

> কিন্তু এপ্রস্তাব সকলের মনঃপুত হইল না, গুরুপাপে লঘুদণ্ড হইবে। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ১৩০)

এটি আইন বিষয়ক প্রবাদ। ন্যায় বিচার ও প্রতিকারহীন সমাজের কাছে মানুষের প্রত্যাশা। বিষয় ও মন্তব্য পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সম্বন্ধযুক্ত জোড় শব্দ অবস্থান নিয়ে কখনো সাদৃশ্য, কখনো বিরোধিতা সৃষ্টি করে। উপন্যাসে শ্রেণি-বিভাজন, শোষিত জনমানুষের হাহাকার ব্যক্ত হয়েছে। উপন্যাসে শ্রেণি-বৈষম্যকে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি শোষকের রুদ্র প্রতাপ কিংবা শোষিতের দুঃসহ দহন, নিপীড়িতের অসহায় ক্রন্দন সমস্ত কিছুই প্রধান হয়ে ওঠেছে। অবধারিতভাবেই প্রান্তিক জীবনের অনুষঙ্গে মানুষের অসহায়ত্ব, দারিদ্র্য, বঞ্চনা কিংবা অবদমনের ইতিহাস উল্লেখিত হয়েছে তবে তা অনেকটাই নির্মোহ দৃষ্টিতে —

> এ আমার পথের পাওয়া। মা-বাপ নাই। সুবলা বউ রাঁড়ি মানুষ করত, পরে নি গো বুজে পরের মর্ম, একদিন খেদাইয়া দিল। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ১৩৭)

উদয় তারার কথায় ফুটে উঠেছে — 'পর কখনো আপন হয়না' — এ মর্মটি। দারিদ্র্যের কারণে বাসন্তী তাই যখন অনন্তকে ঘর থেকে বের করে দেয় তখন যেন এ মর্মই সত্য হয়ে ওঠেছে। সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ, ব্যাপক বিপর্যয়, অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে ধ্বংস হয় মালোদের গোষ্ঠীজীবন। অবহেলা, শোষণের ফলে নিম্নবিত্তের মন অবক্ষয়িত, পীড়িত, বিভ্রান্ত, রক্ষণশীল ও নেতিবাচক হয়ে ওঠে, তার অন্যতম কারণ জীবনের প্রতি অনীহা এবং শ্রেণিগত বিচ্যুতি। রামকেশব এ বিপর্যস্ত মালোদের একজন। সে যেন নিয়তিকে কটাক্ষ করছে—

> নিজেরা কাঁদিয়া ও চোখ মুছিয়া মালোরা যখন তাকে সান্ত্বনা দিতে আসিল, সে বলিল, উপরওয়ালা ফেলিয়াছে চৌদ্দসানকির তলায়, কাঁদিয়া কি করিব। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ১৯৩)

মালোপাড়ার সবচেয়ে বৃদ্ধ রামকেশব, যার ছেলে পাগল হয়ে মরেছে, যে জীর্ণ-শীর্ণ দেহ নিয়ে প্রতিদিন নদীতে মাছ ধরতে যায়, তাকেও যখন ঋণের দায়ে শীতের সকালে ঠাণ্ডা পানিতে নামিয়ে শাস্তি দেয়া হয় তখন সকলে দুঃখ করলেও রামকেশব নিজের নিয়তিকেই দায়ী করেছে।

৪.২. কবিতাশ্রয়ী প্রবাদ

গদ্য প্রবাদগুলির চেয়ে পদ্য প্রবাদগুলো অনেক বেশি চিত্তার্কষক, ছন্দ ও মিলের স্মরণ সহায়ক। কবিতাশ্রয়ী প্রবাদে ছন্দ, মিল এবং অনুপ্রাসের উপাস্থিতি থাকে। 'মূলত শ্রুতিমধুর ও স্মৃতি-সুখকর করার জন্য প্রবচন পদ্যান্বিত হয়ে থাকে।' (ওয়াকিল, ২০০৭:৭৮)। প্রবাদের সংক্ষিপ্ত ছোট পরিসরের বাক্যে কিংবা ছন্দোবদ্ধ দুই চরণের মধ্যে প্রকাশ ঘটে জীবন, জগৎ ও সমাজ সম্পর্কিত গভীর ভাবদ্যোতক অর্থবহ ব্যবহারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার। এভাবে কবিতাশ্রয়ী প্রবাদের মধ্য দিয়ে জাতি বা সমাজের জ্ঞান, মান, ঐতিহ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে মালো সমাজের দৃঢ়মূল নানা ধারণা অভিব্যক্তি পায়। ছোট নৌকা ভর্তি আলু বিক্রি করতে কাদির ও ছাদির দুই পিতা-পুত্র যখন নদী বুকে তখন বৃষ্টিতে নৌকা ডুবে যাবার উপক্রম। আসন্ন বিপদ বুঝে ছাদির তার পিতাকে নিরাপদে যেতে বলে এবং পিতাকে আশ্বস্ত করে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সে চেষ্টা করবে—

> ছেলে বলে, বা-জান তুমি সাঁতার দিয়া পারে যাও। গরীবুল্লার গাছের তলায় গিয়া জান বাঁচাও, আমার যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। যখন দেখুম নাও ডুবতাছে, দিমু সব আলু ঢাইল্যা তিতাসের পানিতে। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ১০৫)

আশায় জীবন, নিরাশায় মৃত্যু । মানুষ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কোনো না কোনো আশা পোষণ করে থাকে। মানব চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ও সমালোচনা অদ্বৈতের অধিকাংশ

প্রবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। জীবনের নির্মম সত্যকে কঠিন বা স্থূল ভাষায় না বলে প্রবাদে ইঙ্গিতময় শোভন ভাষায় বলেছেন। রুচিবান মানুষের কাছে শোভন পন্থায় মানব চরিত্র সম্পর্কে সর্তক সংবাদ এবং হিতকর পরামর্শ ও যথাযথ উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে অদ্বৈতের প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার যথোপযুক্ত ও কার্যকর হয়েছে। উদয়তারা তার বিয়ের স্মৃতি স্মরণ করতে গিয়ে তার স্বামী যে তার যথাস্থানে যথোপযুক্ত কার্যসম্পন্ন করতে পারেনি, তার ফলে তাকে উদয়তারার তিরস্কার —

> ভাল কইরা ছিটতে পার না? মাথায় পড়ে না কেনে ফুল? ডাইনে-বাঁয়ে পড়ে কেনে? কাজের ভাসসি নাই, খাওনের গোঁসাই? (অদ্বৈত, ২০০৮ : ১৪৪)

উদয়তারা যেন তার স্বামীর নিষ্কর্মারূপকে ইঙ্গিত করছে। অদ্বৈতের এ উপন্যাসের কিছু প্রবাদে পারিবারিক জীবন ও পারিবারিক সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রবাদে বাঙালির সংসার জীবনের যে ছবি ফুটে ওঠে তাতে মায়ের আসন সবচেয়ে মমতার ও মর্যাদার। সমাজে মাতৃপ্রাধান্যসূচক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক ও মা ছাড়া সন্তানের যে দুর্দশা তার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ অনন্তবালার কথায় —

> নাই! হায়গো কপাল। মানুষে কয়, মা নাই যার ছাড় কপাল তার। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ১৪৭)

কাজেই মাতৃহারা সন্তান যে ভাগ্যহীন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ অনন্ত। মা ছাড়া তার দুর্ভোগ ও কষ্টের সীমা ছিল না। আত্মীয়তা সম্পর্ক দ্বারা যেমন সমাজের ছবি পাওয়া যায়, তেমনি নৃ-তত্ত্বের তথ্য পাওয়া যায়। পিতৃ ও মাতৃকুল সম্পর্কে সন্তান-সন্ততির সম্বন্ধ বিচার ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণে নৃ-তত্ত্বের উপাদান নিহিত আছে। মামার এবং মাসীর প্রতি ভাগ্নের দৃষ্টিভঙ্গি মধুর। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মাতৃকূলের প্রভাব বেশি। আত্মীয়ের মধ্যে মামা ও মাসী শ্রেষ্ঠ স্থানীয়। এ শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে অনন্তবালা যখন জানতে পারে অনন্তের মা নেই কিন্তু মাসী আছে তখন অনন্তবালা গুরুবাচনিক উক্তি প্রয়োগ করে—

> মাসী আছে তোমার, তবু ভালো। মানুষে কয়, তীর্থের মধ্যে কাশী ইষ্টির মধ্যে মাসী, ধানের মধ্যে খামা কুটুমের মধ্যে মামা (অদ্বৈত, ২০০৮ : ১৪৭)

সমাজ জীবনে আত্মীয় প্রসঙ্গ অনিবার্য এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক নির্ধারিত। সুতরাং আত্মীয়তার মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার মামা ও মাসীর। জেলেপাড়ায় বড় হয়ে ওঠা অদ্বৈতের জীবন অভিজ্ঞতার বাণীরূপ পেয়েছে তার প্রবাদে। তার প্রবাদের ভাবসত্যের জগৎ বাঙালির সাধারণ অভিজ্ঞতার পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেছে বলে তা সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠেছে। উদয়তারাকে তার স্বামী নিতে আসলে তার স্বামী ও বনমালীর কথোপকথনে বনমালী রসিকতা করলে উত্তরে সে বলে —

> তা তুমি যাই কও আর তাই কও, আমি কিন্তু সাঁচা কথাখান কই, 'যদি থাকে বন্ধুর মন, গাঙ পার হইতে কতক্ষণ? মনে থাকিলে গহীন গাঙে কি করিবে। মনে থাকিলে মরাগাঙেও আটকাইতে পারে না। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ২০০)

গরজ একান্ত হইলে আশুক-মাশুকের মিলন পথে কোন বাধাই টিকে না, এখানে যেন সেই ভাবসত্যটি উদ্ভাসিত হয়েছে। মানুষ নিজের দোষ ঢেকে রাখে এবং পরের দোষ দেখে আনন্দে হাত তালি দেয়। এ বাস্তবতা প্রকাশ পায় সুবলার বউ বাসন্তীর কণ্ঠে —

> ভারি আহ্লাদের পাগল। তারার পাগল তারা বাইন্ধা রাখতে পারেনা। কয়, পরের পাগল হাততালি, আপনা পাগল বাইন্ধা রাখি। ছাইড়া দেয় কেনে? পাড়া পড়শীরে জব্দ করার লাগি? (অদ্বৈত, ২০০৮ : ৯৪)

রাধামাধবকে আবির দেয়ার উদ্দেশ্য অনন্তের মা ও বাসন্তী যাত্রা করলে যাত্রাপথে পাগল কিশোর পাগলামী করলে বাসন্তী বিরক্ত হয়ে তাকে ঘরে বাইন্ধা রাখার কথা বলে। ঔপন্যাসিক প্রতিটি বিষয় ও ঘটনাকে প্রবাদের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। দোলগোবিন্দের মুমূর্ষু অবস্থা তথা জীবনের ক্ষণিকতা প্রকাশেও দক্ষ ও নিপুণ কারিগরের ন্যায় প্রবাদের প্রয়োগ ঘটান —

> হ। একেবারে হাতে-বৈঠা-ঘাটে নাও অবস্থা (অদ্বৈত, ২০০৮ : ১৬০)

৪.৩. গ্রাম্য বা লোকজ প্রবাদ

উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা লেখকের অভিজ্ঞতার ভাষা। তিতাসের স্রোতের মতোই ভাষাতে এসেছে একটা মৃদু সংগীত-যা জীবনের মৃদু এবং মেদুর, সুখ এবং দুঃখ ধ্বনিত করেছে অসীম নীলাকাশের অঙ্কশায়ী নদীর অস্পষ্ট এবং চিরন্তন তরঙ্গ কল্লোলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। তিতাস তীরবর্তী জনজীবনকে উপস্থাপনের প্রয়োজনে তিনি সে জীবনের প্রচলিত শব্দ ও বাক্‌রীতি অনুসরণ করেছেন। সংলাপ নির্মাণেই শুধু নয়, বর্ণনায়ও ঔপন্যাসিক প্রায়শ ব্যবহার করেছেন লোকজ প্রবাদ। শ্যামসুন্দর বেপারির চতুর্থ বিয়ে প্রসঙ্গে গুরুদয়াল ও কালোর ভাইয়ের কথোপকথনকালে গুরুদয়াল ব্যাখ্যা করে শেষ-কাটালে স্ত্রী কত গুরুত্বপূর্ণ কেননা বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের কাছে আশা করা সম্পূর্ণ বৃথা —

> হ। কইছ কতা মিছা না। শেষ-কাটালে ইস্তিরি কাছে না থাকলে মরণ-কালে মুখে একটু জল দিবে কেডায়? পুত ত কুত্তার মুত। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ৭৮)

বৃদ্ধকালে পুত্রের নিকট পিতা গুরুত্বহীন ও অবহেলার পাত্র তা এখানে স্পষ্ট। সন্তানের সঙ্গে পিতার ও মাতার সম্পর্ক ও অধিকার দ্বারা পিতৃতন্ত্র ও মাতৃতন্ত্র নির্ণীত হয়। আমাদের সমাজে মা সন্তানকে সহজে ত্যাগ করে না, মায়ের অর্বতমানে পিতা দ্বিতীয় বিবাহ করলে সন্তানের সাথে দূরত্ব বেড়ে যায়। মাতৃ হারা হলে শিশু সন্তানের হয় চরম বিপদ, কেননা মা ছাড়া বাবা পর হয় আর ভাই হয়ে যায় পশুর ন্যায় নিষ্ঠুর। কাদির অনন্ত ও তার ন্যায় হতভাগা মা ছাড়া ছেলেদের নির্মম ও হতভাগ্য অবস্থা দর্শন করে :

> কেউর মা নাই, বাপ নাই, লাথি ঝাঁটা খায় কেউর মা আছে দানা দিতে পারে না। কেউর বাপ আছে মা নাই। লোকে কয়, মা মরলে বাপ তালই, ভাই বনের পশু। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ১১১)

প্রবাদটির সামাজিক তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। প্রবাদটি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে অনুমিত হয়। জীবনের বহুমাত্রিক টানাপোড়েন, সীমাহীন জটিলতা, মানবের মানসপটেও বিভঙ্গতা, বহুভুজ বিসঙ্গতি ও অন্তগূঢ় যন্ত্রনার জন্ম দিয়েছে। ঔপন্যাসিক অদ্বৈতের উপন্যাসে এই দিকটি সন্নিবেশিত হয়েছে শাণিত ভাষার দীপ্তিতে। এরই একটি চিত্রময় পরিবেশনা পরিলক্ষিত হয় প্রবাদের মধ্য দিয়ে —

> গাঙে গাঙে দেখা হয়, তবু ভইনে ভইনে দেখা হয়না। বড় ভাল মানুষ আমার বড় ভইন নয়ন তারা আর ছোট ভইন আসমানতারা। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ১৩৫)

'উদয়তারা, নয়নতারা, আসমানতারা তিন বোনের তিন দেশে বিয়ে এবং সংসার যন্ত্রের যাতাকলে আবিষ্ট থাকায় তিন বোনের যে বহুকাল সাক্ষাৎ হয় না উদয়তারার অনন্তের সাথে কথায় সেই আক্ষেপ পরিস্ফূট হয়ে উঠেছে। আত্মীয়দের মধ্যে পরস্পর যাতায়াত থাকলে আন্তরিকতা যে বৃদ্ধি পায়, তা বাসন্তী অনন্তের মাকে বুঝায়, কেননা রামকেশবের বাড়িতে তথা অচেনা মানুষের বাড়িতে দাওয়াত আসলে অনন্তের মা সেখানে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। বাসন্তীর যুক্তি —

> দিদি, তুমি মনে কইরা দেখ, আমিও অচিনা আছলাম, চিনা হইলাম। মানুষের কুটুম আসা-যাওয়া আর গরুর কুটুম লেহনে-পুছনে। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ৮৭)

প্রবাদটি এরূপেও প্রচলিত আছে "মানুষের কুটুম দিলে-থুলে, গরুর কুটুম চাট্‌লে চুট্‌লে।' অর্থাৎ আত্মীয়দের মধ্যে পরস্পর যাতায়াত থাকলে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।" (মোহাম্মদ, ২০১২ : ৬০) দুই বা ততোধিক বিষয়, ব্যক্তি বা বস্তু সমান গুরুত্ব পায় এরূপ প্রবচনে। প্রবচনে মানুষের মধ্যে কুটুম্বিতা ও গরুর মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখার কৌশল তুলে ধরা হয়েছে। সমাজ-সময়-রাষ্ট্রের বৈচিত্র্যময়তার রূপায়ণে অদ্বৈতের প্রাতিস্বিকতা যেমন সর্বজন বিদিত, তেমনি গ্রামীণ সমাজ কাঠামোর মহাজনী শোষণ, বিনিয়োগকারীদের মুখোশ উন্মোচনেও তাঁর দৃষ্টি অন্তর্বাহী। তাঁর প্রবাদে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়, শ্রেণি ও পেশার মানুষের স্বভাব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। সমালোচনা করা হয়েছে ত্রুটি বিচ্যুতির। উপন্যাসে এমনই মহাজনী শোষক শ্রেণির প্রতিভূ কৃষ্ণচন্দ্রের রূপ ফুটে উঠেছে বাসন্তীর বক্তব্যে —

> আর এই যে কানা মানুষ, তিনি লোকের বিচার করিতে গিয়া শ্বশুরের বিছানায় বউ শোয়ায়, জামাইর বিছানায় শাশুড়ি শোয়ায়,' তার নাম কৃষ্ণচন্দ। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ৬২)

৪.৪. প্রমিত ভাষারীতি আশ্রয়ী প্রবাদ

'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সূত্রে অর্জিত জীবনকথাকে দার্শনিক ব্যঞ্জনায় অন্বিত করতে চেয়েছেন তিনি। এ তার সচেতন শিল্প প্রয়াস এবং এই জন্য নিজের ভাবাদর্শগত অবস্থান সম্পর্কে কোথাও তাঁর মনে অস্পষ্টতা নেই' (তপোধীর, ১৯৯৯ :

৮৫) অদ্বৈত প্রবাদের প্রথাগত, চিরকেলে কাঠামো চূর্ণ করে নির্মাণকলায় নতুনত্ব এনেছেন। প্রবাদের নতুনরূপে সঞ্চালন স্বনির্মিত শিল্প প্রয়াসের এক অসামান্য দৃষ্টান্ত। মালো বংশোদ্ভূত অদ্বৈত জীবনদৃষ্টিতে একান্তভাবেই নেতিবাচকতার বিরুদ্ধবাদী, স্বজাতির সংস্কৃতি গৌরবে উদ্ভাসিত এবং নিজ সম্প্রদায়ের জীবন রচনায় প্রবল মমত্ববোধে আক্রান্ত। তিনি জীবনের সকল দুঃখ-যন্ত্রণা, হীনতা, ক্ষুদ্রতাকে সযত্ন পরিচর্যায় প্রত্যাহার করে শাশ্বত জীবনের আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। তার বর্ণনাতেও প্রমিত ভাষারীতি সম্পন্ন যে প্রবাদের ব্যবহার রয়েছে সেখানে তার নিজস্ব ভাবনা, অভিজ্ঞতা ও ভাবের সমন্বয় ঘটেছে; আর তা পাঠকমনকে এক নির্বিকার ঔদাসীন্যে আচ্ছন্ন করে গভীর এক ভাবে নিমজ্জিত করে। তিতাসের বুকে নৌকায় চড়ে যে বউরা স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আর বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যায় তাদের একদিকে থাকে সুখের উচ্ছ্বাস অন্যপাশে থাকে কষ্টের কান্না। অর্থাৎ হাসি কান্নার ঢেউ বুকে নিয়ে বউরা স্বামীর বাড়ি ও বাবার বাড়ি যায়—

> যে বউ স্বামীর বাড়ি যায়, তার এক চোখে প্রজাপতি নাচে, আরেক চোখে থাকে জল। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ০৬)

হাসি-কান্না জড়িত এ অবস্থার বর্ণনায় প্রবাদটি অনেকে এভাবেও ব্যবহার করেন 'এক চোখে থাকে হাসি, আরেক চোখে থাকে কাঁদা'। অনেক প্রবাদ আছে যা হয়তো প্রথাগত নয়, লেখকের নিজস্ব সৃষ্টি। শ্যামসুন্দরের চতুর্থ বিবি ঘরে আনার আয়োজনে গ্রামে এক বর্ষীয়সীর কথায় উঠে আসে শ্যামসুন্দরের প্রথম স্ত্রী তথা নন্দর মা ও সে একই বয়সের। অথচ দুইজনের দুই অবস্থাপন্ন ঘরে বিয়ে হওয়ায় নিজের সাথে নন্দর মার তুলনা করে—

> এক বছরই দুই জনার জন্ম, বিয়াও হইছে একই গাওয়ে। সে পড়ল বড় ঘরে, আমি পড়লাম গরিবের ঘরে। তার হাতে উঠল সোনার কাঠি, আমার হাতে ভাতের কাঠি। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ৭৯)

নিজের ভাগ্যের সাথে শ্যামসুন্দরের বউয়ের তুলনার সাথে সাথে নিজের নাতনির বয়সের মেয়েকে বিয়ে করার ফল উল্লেখ করে বয়স্ক বিবাহের সঙ্গে বাল্য বিবাহের পরিণাম তুলে ধরে —

> আজ যার সাথে বিয়া হইতাছে এ যে নন্দর মার নাতিনের সমান। এরে লইয়া বুড়া করব কি গো? এর যখন কলি ছিটব, বুড়া তখন ঝইরা পড়ব। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ৭৯)

প্রবাদটি এভাবেও প্রচলিত আছে 'বিবি যখন বড় হবে, মিঞা তখন কবর লবে'। মালোসমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির সেদিন পরাজয় ঘটেছে, তারা যখন বর্হিসংস্কৃতি বা সস্তা জনপ্রিয় সঙ্গীতকে গ্রহণ করেছে সেই দিন থেকে তাদের যৌথ-জীবনের সমাপ্তি, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। যাত্রাদলের আধিপত্যের বিরুদ্ধে মালোরা প্রতিবাদ করার জোর পেত না। কখনোও নিজেরাই এর সাথে সম্পৃক্ত হত। কখনো কখনো এ বিষয়

নিয়ে নিজেরা নিজেরা ঝগড়া করত। ফলে একজন আরেকজনকে উপদেশ দিত নিজেকে সামলে যেন পরে অন্যকে বলতে আসে —

> এ বাড়ির লোক ও বাড়ির লোককে খোঁটা দিত। ও বাড়ির লোক রাগিয়া বলিত, ভেনভেন করিস না ত। আগে নিজের ঘর সামলা। তারপর পরের তরকারিতে লবণ দিতে আসিস। সত্যি কথাই! তার নিজের ঘরের লোককে সামলাইতে গেলে সেখানেও রাগারাগি হইত। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ১৯২)

'আগে আপন শামাল কর, শেষে গিয়া পরকে ধর।' আগে নিজে সংশোধিত হয়ে পরে অন্যের দোষ সংশোধন করতে যাওয়া কর্তব্য। অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রবাদ প্রতিম গঠনকৌশলটি গ্রহণ করেছিলেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। তিনি মিথের প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন যেখানে নদীজীবনের সঙ্গে এই মিথের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। ঘটনা এবং বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে মিথকে সমন্বিত করেছেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। প্রচলিত 'খড়ম পায়ে দিয়ে গঙ্গা পার' প্রবাদটিকে ঔপন্যাসিক মোহনের ছেলেবেলার শোনা গল্পের সাথে নিজস্ব ভাষা বৈশিষ্ট্যে অনন্যরূপে উপস্থাপন করেছেন—

> সে ছেলেবেলা গল্প শুনিয়াছে। কোনো এক সাধু খড়ম পায়ে দিয়া এই তিতাসের বুকের উপর দিয়া হাঁটিয়া পার হইয়া যাইত। সেটা শুধু মন্ত্রবলেই সম্ভব হইয়াছিল। (অদ্বৈত, ২০০৮ : ১৯৪)

অদ্বৈত মল্লবর্মণের কালোত্তীর্ণ কথাশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে যেসব উপাদান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে প্রবাদ-প্রবচনের বহুমুখী প্রয়োগ সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাঁর সময়, সমাজ জীবন সচেতনতার প্রকাশ ঘটেছে প্রবাদ-প্রবচনে। *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় যে জীবনকে অঙ্কন করেছেন, সে জীবন নগর-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্তমানসের অভিজ্ঞতাবহির্ভূত। তিতাস-বিধৌত জনপদের স্থানিক বর্নিমার সঙ্গে সে অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার বিশ্বস্ত রূপায়ণ এ উপন্যাস। 'উপন্যাসে প্রচুর প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক; যেগুলো তিতাস-তীরবর্তী মানুষের মনোভাব, বিশ্বাস-সংস্কার, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতারই বিশ্বস্ত রূপায়ণ' (গিয়াস, ২০১৫ : ৫১) যেমন- আরো কয়েকটি প্রবাদ-প্রবচন যা এ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে- 'জিভে কামড় শিরে হাত, কেমনে আইল জগন্নাথ;' 'শ্যাওড়াগাছের কাওয়া'; 'কাকের মুখে সিন্দুইরা আম'; 'আ-ঘাটাতে চন্দ্র উদয়'; শিবের মতন চোখ'; 'দেড় নিয়তি'; 'কাটুনি সুতা কাটতে পারে, 'একনাল সুতায় হস্তী বান্ধা পড়ে'; 'মনের বনে রঙের ছোঁয়া'। মালো সমাজ, জীবন, চরিত্র ও স্বভাব পরিস্ফুটনে ও ঘটনা উপস্থাপনে ঔপন্যাসিক উপন্যাসে যেমন প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করেছেন, তেমনি প্রয়োগ ঘটিয়েছেন বহু বাগধারার। উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকটি বাগধারা হল-'গলায় গলায় ভাব'; 'হরির লুট'; 'মাথা-তোলা'; 'হাতে খড়ি'; 'কড়াগণ্ডা'; 'উভয়সংকট'; 'তাল-কাটা'; 'রাঘব-বোয়াল'; 'আঁটকুড়ার রাজা'; 'কুম্ভকর্ণ'; 'গলগ্রহ'; 'কান খাড়া হওয়া'; 'চাঁদের হাট'; 'পুঁটি মাছের পরান'; 'গো-বেচারা'; ' গড্ডলিকা প্রবাহ' প্রভৃতি।

৫. উপসংহার

আজ অবধি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসের যে বিশেষ মূল্যমান নিরূপিত হয়েছে তার অন্যতম প্রান্ত হলো ভাষা, বিশেষত এর প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারার বিশেষরূপে ব্যবহার। কেননা এসকল প্রবাদ প্রবচন বিচিত্র বিষয় ও পরিবেশ এবং পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে। ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিহৃদয়, অভিজ্ঞতা, অনুভূতির উপস্থাপনায়, উচ্চারণে প্রবাদের কখনো গদ্যধর্মী, কখনো ছন্দধর্মী প্রকাশনায় এবং লোকজ ও আধুনিকতার স্পর্শে ও সমন্বয়ে উপন্যাসের ভাষা ঋদ্ধ। এ উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রবাদের ভাষা রূপান্তরিত ও গৃহীত হয় চিরকালের বাঙালির ভাষা অনুষঙ্গে নির্দিষ্ট অঞ্চল বা নির্দিষ্ট জনসমাজের বা বিশেষ লোক সম্প্রদায়ের সীমা ভেঙে প্রবাদগুলি সাধারণ মুহূর্তকে অনন্ত অসাধারণ মুহূর্তে এবং সর্বজনীন রূপে রূপান্বিত করে নিল – উপন্যাসের প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা আলোকপাত শেষে এ বোধেরই জন্ম হয়। প্রতীকী, বিচিত্র অর্থ প্রকাশকারী, বৈচিত্র্যময়, চিত্রকল্পময়, ধ্বনিময়, গীতল প্রবাদের মিথস্ক্রিয়ায় উপন্যাসের ভাষা পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও শিল্পান্বিত হয়েছে।

তথ্যপঞ্জি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। (১৯৯৬)। *খোয়াবনামা*, ঢাকা : মাওলানা ব্রাদার্স।

শওকত ওসমান। (২০০০)। *উপন্যাস সমগ্র*, ঢাকা : সময় প্রকাশনী।

বিশ্বজিৎ ঘোষ। (২০১২)। *লোকপুরাণ জনসমাজ ও কথাশিল্প*, ঢাকা : নান্দনিক প্রকাশনী।

রফিকউল্লাহ খান। (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

শান্তনু কায়সার। (১৯৮৭)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) জীবনী গ্রন্থমালা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ। (২০০৮)। *তিতাস একটি নদীর নাম*, বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, ঢাকা : আজকাল প্রকাশনী। (বর্তমানে লেখায় উদ্ধৃত প্রবাদ প্রবচন ও বাগধারাসমূহ এ গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে)।

মোহাম্মদ হানীফ পাঠান। (২০১২)। *বাংলা প্রবাদ পরিচিতি*, ঢাকা : অবসর প্রকাশনী।

ওয়াকিল আহমদ। (২০০৭)। *বাংলা লোকসাহিত্যের ধারা*, ঢাকা : বইপত্র প্রকাশনী।

গিয়াস শামীম। (২০১৫)। *বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাস*, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী সংস্থা।

তপোধীর ভট্টাচার্য। (১৯৯৯)। *উপন্যাসের প্রতিবেদন*, কলকাতা : র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন।

তরাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৩৭৯ বঙ্গাব্দ)। *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।

শুভ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। (২০১৩)। *কমলকুমার সৃষ্টি বৈচিত্র্যের খোঁজে*, কলকাতা : প্রকাশ ভবন।

ড.অমরেন্দ্র গনাই। (২০০৯)। *শান্ত পদাবলী: ভাব ও শিল্পসৌন্দর্য*, কলকাতা : ভাষা ও সাহিত্য প্রকাশনী।

সৈয়দ আকরম হোসেন। (১৪২১ বঙ্গাব্দ)। *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, ঢাকা : ধ্রুবপদ প্রকাশনী।

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান। (২০০৮)। "নদীজীবনের সংহিতা: পদ্মানদীর মাঝি এবং গঙ্গা", *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক*, ঢাকা : অবসর প্রকাশনী।